উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্প: প্রসঙ্গ অস্তিত্বের লড়াই

Existence' বা 'অস্তিত্ব' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'ex-sistere' (out-take a stand) থেকে, যার অর্থ 'Stand out' অর্থাৎ ক্রম-অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ বা ব্যক্তির অন্তরের বিচিত্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। 'অস্তিত্বে'র সাধারণ অর্থ 'থাকা' বা 'বিদ্যমান হওয়া'। মানুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, মৃত্যু, অসুস্থতা, উৎকণ্ঠাজনিত কারণে বিভিন্ন সংকট ও সমস্যার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের ধারণা বিকশিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক জীবন এবং আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট থেকে অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনার বিস্তার লক্ষিত হয়। এই অস্তিত্বকে নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে 'অস্তিত্ববাদ'।

আধুনিক যুগে দর্শনশাস্ত্রে অস্তিত্ববাদের প্রথম প্রবক্তা দার্শনিক কিয়েৰ্কেগার্দকে (১৮১৩-১৮৫৫) বলা হয়ে থাকে। তিনি অস্তিত্বের স্তর হিসেবে ভোগীয় স্তর, নৈতিক স্তর ও ধর্মীয় স্তরের কথা বললেও শেষমেশ একমাত্র ধর্মীয় জীবনেই মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।[১] অপর এক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল জেসপার্সের (১৮৮৩-১৯৬৯) মতে, ব্যক্তি তার অস্তিত্বের সঠিক তাৎপর্য কেবল কোনও সংকট মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারে।[২] অসুস্থতা, মৃত্যু, অনুশোচনা কিংবা অতীতের কোনও অপরাধবোধ— এরকম সংকটকালেই রহস্যময় অস্তিত্বের স্বরূপ সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়। অস্তিত্বের ধারণা সম্পর্কে মার্টিন হাইডেগার মনে করেন— মানুষ অচেতন, স্বতঃস্ফূর্ত ও অমূর্ত উপলব্ধির মুহূর্তেই তার যথার্থ অস্তিত্বে এসে উপনীত হয়।[৩] ব্যক্তিবাদী অস্তিত্বের কথা বলেছেন জ্যাঁ পল্ সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), যেখানে তিনি গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তিসত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অস্তিত্ববাদের সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে নানা জটিলতা ও তর্ক-বিতর্ক থাকলেও আধুনিক অস্তিত্ববাদী আলোচনায় সার্ত্রের প্রদত্ত যে সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে— "অস্তিত্ববাদ হল এমন একটি দার্শনিক আন্দোলন— যা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে, সাধারণ অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে; বিমূর্ত, কাল্পনিক বা বস্তুগত ধারণা হিসেবে নয়, মূর্ত ও বাস্তব ধারণা হিসেবে...।"[৪] সার্ত্রের জীবনসঙ্গিনী সিমোন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) অস্তিত্বের ধারণা হিসেবে 'আত্ম' (Self)

ও 'অপর'কে (Others) চেতনার মতো আদিম বলেছেন। তাঁর মতে, পুরুষ হচ্ছে 'আত্ম' আর নারী হচ্ছে 'অপর'। 'আত্ম' বা পুরুষের সত্তা সবসময় 'অপর' বা নারীর সত্তাকে নিজেদের অধীনে রাখতে চায়। তারা সমাজে নারীর অস্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হতে দেয় না।[৫]

'অস্তিত্ব'কে নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে নানা দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন-খণ্ডন, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অস্তিত্ববাদের বিকাশ হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে। যুদ্ধোত্তর সময়ে বিপর্যস্ত ইউরোপে ও উত্তর এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী শাসনের অবসান হয়ে তার পরিবর্তে মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। একসময় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুঁজিবাদী সমাজ ও বুর্জোয়া সভ্যতা, কিন্তু মার্কসীয় চিন্তা-চেতনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ লাভে তারা ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক রাষ্ট্রে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু এই সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদী সমাজ একেবারে ধ্বংসও হয়ে যায়নি। সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা এবং বুর্জোয়া সভ্যতা উভয়ের লক্ষ্য ছিল শাসন, শোষণ এবং প্রভুত্ব স্থাপন। এরা সংখ্যায় ছিল সামান্য। আর পৃথিবীব্যাপী বিরাট সংখ্যক মানুষ এই সামান্য সংখ্যক মানুষের কর্তৃত্বের লোভ, ক্ষমতার লোভে ভোগান্তির মধ্যে পড়েছিল। এই সংকট মুহূর্তেই দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনায় অস্তিত্বের ধারণা বিকাশ লাভ করে।

সাহিত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনকে তুলে ধরবার বা প্রচারের একটি বড় মাধ্যম। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে যাঁরা প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— জ্যাঁ পল্ সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), অ্যালবার্ট কেম্যু (১৯১৩-১৯৬০), ডস্টোয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), উনামুনো (১৮৬৪-১৯৩৬), সিমোন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬)। উক্ত লেখকরা নিজস্ব স্থান এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তা-চেতনাকে সাহিত্যের মধ্যে অর্পণ করেছেন। গবেষণা প্রকল্পে সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রকরণ ছোটোগল্পে অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোচনার জন্য স্থান হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী ষাট-সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি কীভাবে অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কায়িত সেই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। 'অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই' শিরোনামে আমরা দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে 'অস্তিত্বে'র একটা সাধারণ ধারণা নিয়ে আমরা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বলতে

বোঝার চেষ্টা করেছি শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা, দমন, নির্যাতন এবং যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের টিকে থাকা, বেঁচে থাকা, সংকট মুক্তি, অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়কে।

১৯৪৭ সালে দেশের সবচাইতে বড় ঘটনা স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এরপর সংবিধান তৈরি হয় এবং সংবিধান সংযোজন ও সংস্করণে নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত হয়। কিন্তু বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে অধিকাংশ মানুষের জীবন-ইতিহাসের যেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি, তেমনি এক শ্রেণির মানুষ সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধে থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে আছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী, নিম্ন শ্রেণির কৃষক ও অন্যান্য নিম্ন বিত্তের মানুষ। স্বাধীনতার এক-দুই দশক পরেও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ আর এক শ্রেণির মানুষ তাদের শোষণের দ্বারা অর্জিত ধনের সাহায্যে ভোগ-বিলাসী জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির মধ্যে আছে সমাজপতি, জমিদার, জোতদার নেতা, মন্ত্রী, পুঁজিপতি এবং এই শ্রেণির দ্বারা অধীনস্থরা শোষণের জাঁতাকলে পেষিত হয়ে জীবন অবনতির তলানিতে গিয়ে ঠেকে। সেই শোষণ থেকে রেহাই পায়নি বঞ্চিত, অবহেলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নারীরাও। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাদের ন্যূনতম অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশ, ষাট-সত্তরের দশকে শোষণের বিরুদ্ধে অধীনস্থদের পক্ষ থেকে উঠে আসে প্রতিবাদ। এই সময়, বিশেষত ষাট-সত্তর দশকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক (মার্কসীয় শ্রেণিচেতনায় প্রলেতারিয়েত শ্রেণির জাগরণ, ফরাসি বিপ্লবে ছাত্রশক্তির অভ্যুত্থান (১৯৬৮), চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-১৯৭৬), লাতিন আমেরিকার পরিবর্তনের হাওয়া, ১৯৭৫-'৭৬-এ দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে গিনি বিসাউ এবং মোজাম্বিকের জয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৫) বাংলার মাটিতে ঢেউ তোলে। দেখা যায়— খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন, কম মজুরির বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্মঘট, ডাক আন্দোলন এবং এইসব আন্দোলনে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের (বিদ্রোহী অংশের) সবিশেষ অংশগ্রহণ। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বাইরে নিম্নবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত (বিদ্রোহী অংশ), এমনকি নারীরা বঞ্চনা, অবহেলা, অপমান, দমন ও সর্বপরি বিপন্ন অস্তিত্বের লড়াইয়ে প্রতিবাদী হয়েছে। যে কারণে বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশক পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ বিবর্তনের ক্রান্তিপর্ব হিসেবে চিহ্নিত।

বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশক বিভিন্ন কারণে উত্তাল, অগ্নিগর্ভ সময় হিসেবে চিহ্নিত। খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ, সামতান্ত্রিক শোষণ, শ্রমিকদের কম মজুরি, ছাঁটাই, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, গুণ্ডারাজ, পুলিশি নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি নানা কারণে ষাট-সত্তর দশকের যাপিত জীবন ছিল সংকটে পূর্ণ। মানুষ একটা ভয়ংকর দুঃসময়ের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করত। একদিকে কৃষক-শ্রমিকদের ওপর শোষণ, অন্যদিকে রক্তাক্ত রাজনীতিতে উদ্বেলিত মানুষ (বিশেষ করে নাগরিক ছাত্র-যুব)— সবমিলিয়ে সময়ের চলমানতায় নেমে এসেছিল অশান্তির অন্ধকার। সময় ও নোংরা রাজনীতির অভিশাপে গ্রামের খেটে খাওয়া খেতমজুর, ভাগচাষি, নিম্ন কৃষক, কলকারখানার শ্রমিক, নিম্ন শ্রেণির কেরানি থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত নারী-শিশু-বৃদ্ধ সকলেই ছিল হতাশা, গ্লানি, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিমজ্জমান। কারও জীবন হারিয়ে যাচ্ছিল রক্তাক্ত রাজনীতিতে যুক্ত থাকার কারণে, কারও জীবন সরে পড়ছিল নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা-শূন্যতার কারণে, কাউকে বা মরতে হচ্ছিল ক্ষমতাধারীদের কাছে অধিকার ও দাবি-দাওয়া জানাতে গিয়ে অর্থাৎ ষাট-সত্তর দশকে অবহেলিত, অপমানিত, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের জীবনে অস্তিত্বের সংকট প্রবলভাবে স্পষ্ট। ষাট-সত্তর দশকের মধ্যবর্তীকালীন পর্বে সৃষ্টিশীল অনেক শিল্পস্রষ্টার হাতে এই সময়ের ঘটনার প্রভাব ও প্রতিফলন হতে দেখা যায়। তবে ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্পকে কেন্দ্র করে আমাদের গবেষণায় আমরা মৃত্যুকে দেখাইনি। আমাদের গবেষণায় যাবতীয় অন্যায়, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ অন্বেষণ করেছি।

২

মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে। আর স্বাধীনতা পরবর্তী ষাট-সত্তর দশকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়েও নানান উত্থান ও পতন, নির্মাণ ও বিনষ্টি, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কালে লক্ষিত হয়েছে মানুষের প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। আমাদের বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমরা ষাট-সত্তর দশকের অন্তবর্তীকালীন বাংলা ছোটোগল্পে তা অন্বেষণ করবার প্রয়াস করেছি। বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে—

১. স্বাধীনতার এক-দুই দশক কেটে যাবার পরও নিম্নবিত্ত মানুষের ওপর সামতান্ত্রিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন, লাঞ্ছনার ইতিহাস বাংলা গল্পকার ও

তাঁদের লেখা ছোটোগল্পকে কতটা প্রভাবিত করেছে এবং সেখান থেকে মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রসঙ্গ কীভাবে উঠে আসছে।

২. ষাট-সত্তর দশকের অর্থনীতির উন্নয়ন-অবনতি ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন মধ্যবিত্ত মনন ও চেতনাকে কতটা প্রভাবিত করেছে এবং উক্ত সময়ের বাংলা গল্পে কোন বিশেষ মানসিক চেতনা নিয়ে তারা উপস্থিত বা তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের গতি-প্রকৃতি কেমন ছিল।

৩. বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে যখন নারী সম্পর্কিত আলোচনা অনেক বিকশিত তখনও দেখা যায় নারীরা লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অবমূল্যায়নের শিকার। এবিষয়ে ষাট-সত্তর দশকের গল্পকারেরা নারীর অবস্থান ও সংকটকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

৪. বিভিন্ন দলিল ও সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছু প্রতিবাদী নারীর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প নামক শিল্প প্রকরণে তারা কীভাবে উঠে এসেছে।

৫. সবশেষে, একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসেও অস্তিত্বের জন্য মানুষের নিরন্তর লড়াই প্রাসঙ্গিকতা।

৩

সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে ষাট-সত্তর দশকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের কথা উঠে এসেছে নানাভাবে। আমার জানা মতে এই দুই দশকের সময় এবং জনজীবনে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিষয়ের বিচিত্র অভিমুখ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন— অরূপকুমার দাস, অনিল আচার্য, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, সেলিম বক্স মন্ডল, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজমোহন মিত্র, সুমিত অধিকারী, শ্রাবণী পাল প্রমুখ। তাঁদের লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ছাড়াও 'দেশব্রতী', 'সমকাল', 'পরিচয়', 'বর্তিকা', 'লিবারেশন' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখক ও সমালোচকেরা যুগ-ভাবনাকে তুলে ধরেছেন।

অরূপকুমার দাস 'ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য'[৬] শিরোনামে তাঁর গবেষণা গ্রন্থে তিনি ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রভাব রয়েছে এমন গল্প ও উপন্যাস বিশ্লেষণ করে সময়ের সামাজিক গুরুত্বের সঙ্গে গল্প ও উপন্যাসের যোজ্যতা

নিরূপণ করেছেন। ষাট ও সত্তর দশকের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, নির্মাণ-বিনষ্টি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, রাজনৈতিক আদর্শ ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব যেসব গল্প ও উপন্যাসের ভিত্তিমূলে সংগ্রহীত, সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার বাঙালি জীবনের স্পন্দন এবং দেশ, জাতি ও সত্তার অভিজ্ঞান অন্বেষণ করেছেন।

অনিল আচার্য 'সত্তর দশকের ছোটোগল্প'[৭] শিরোনামে এই প্রবন্ধটিতে সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, শিল্পী ও শিল্পকর্ম, গণসঙ্গীত, চলচ্চিত্র, থিয়েটার, উপন্যাস, সবশেষে গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। সত্তর দশকের গল্পের আলোচনায় প্রথমে তিনি সত্তর দশকের সারাংশ বলে নিয়ে সেইসব গল্পকার ও গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন যা সত্তর দশকের উত্তাল সময়কে এড়িয়ে না গিয়ে সময়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছে।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'গল্পে সত্তর দশক'[৮] শিরোনামে নিবন্ধটিতে গল্পের বিশ্লেষণে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সত্তর দশকের বিশেষ জনজীবন ও প্রবণতার সূত্রায়ন বুঝে নেবার প্রয়াস করেছেন। তিনি সেই সমস্ত গল্পের আলোচনা করেছেন যেখানে আছে প্রলেতারিয়েত, পেটিবুর্জোয়া, ছাত্র, কৃষক ও খেতমজুর। তিনি সত্তরের দশকের গল্প আলোচনায় একথাও বলেছেন যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর থেকে 'সামগ্রিক প্রত্যাখ্যানে'র চাপ এত প্রবল ছিল যে বুদ্ধদেব গুহ, প্রতিভা বসুর মতো লেখক এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো 'প্রেম ও মনস্তত্ত্বের পেশাদার' লেখকও সমকালের চর্চিত বিষয়ের ওপর গল্প লিখেছেন। সত্তর দশকের গল্প লেখার প্রবণতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এও দেখিয়েছেন যে, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, সুব্রত সেনগুপ্তের মতো শাস্ত্রবিরোধী লেখকরা বড় বাণিজ্যিক পত্রিকার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শাস্ত্রবিরোধিতা ছেড়ে দেন।

নির্মল ঘোষের 'নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য'[৯] গ্রন্থটি নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং কৃষক চেতনাকে নিয়ে লেখা। আলোচক, 'যাঁদের আত্মবলিদান ক্রমাগত আত্মরক্ষার বিরুদ্ধে লড়ছে' তাঁদের সকলকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে আরোপিত করে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের সকলকে নিয়ে একটি সমীক্ষা নির্মাণের প্রয়াস করেছেন নির্মল ঘোষ। এই গ্রন্থে তিনি

আকরপঞ্জির সাহায্যে রাজনৈতিক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন সংঘঠনের পর থেকে রচিত নাটক, কবিতা, উপন্যাস ও গল্পের বিচার বিশ্লেষণ করে কৃষক চেতনা ও যুগ ভাবনাকে দেখিয়েছেন।

সেলিম বক্স মন্ডল 'সত্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস'[১০] শিরোনামে গ্রন্থটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন— সাতের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক আবর্তের মাঝখানে প্রগতিশীল ঔপন্যাসিকেরা প্রশাসনযন্ত্র, রাজনৈতিক দল এবং শক্তিশালী প্রচার মিডিয়ার (সংবাদপত্র এবং একইসঙ্গে কমিউনিজম বিরোধী দক্ষিণপন্থী পত্রিকা-পুষ্ট সাহিত্যিকদের যূথবদ্ধ সম্প্রচার) ত্রিমুখী আক্রমণের মাঝখানে কীভাবে সংহতি ও স্থিতি অর্জন করেছিলেন তারই ইতিহাস মন্থন এই গ্রন্থ। তিনি কোনও দলমত চিহ্নিত পথে না হেঁটে প্রগতিশীল সাহিত্য ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে এক সরল স্বতন্ত্রীকতার বৈশিষ্ট্যে সাতের দশকের রাজনৈতিক উপন্যাসকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সময়ের দাগ ও বিদীর্ণ দর্পণ'[১১] শিরোনামে নিবন্ধটিতে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলা উপন্যাস আলোচনা করে বাঙালি জীবনের যাপন চিত্র, লাঞ্ছিত অস্তিত্বের বেদনা, নিরুপায়ত্ব, গত্যন্তরহীনতাকে আপন ব্যক্তিক অনুভূতিতে যুগ-সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে মুক্তি দান করেছেন।

সরোজমোহন মিত্র 'বাংলা ছোটগল্পে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব'[১২] নিবন্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার জন্য সংগঠিত আন্দোলনকে বোঝাতে চেয়েছেন। এবং তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের দাবিকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সরোজমোহন মিত্রের এই সন্দর্ভটি রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রণোদিত। এখানে তিনি সেই সব গল্পকারদের গল্প আলোচনা করেছেন যাঁরা কোন না কোন ভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং যাঁদের লেখা বামপন্থী পত্র-পত্রিকা ও লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতো।

সুমিত অধিকারী 'নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত বাংলা কথাসাহিত্য: অপর এক ধ্বংসের বৃত্তান্ত'[১৩] শিরোনামে নিবন্ধটিকে কয়েকটি উপশিরোনামে ভাগ করে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ব্যক্ত

করেছেন; উপশিরোনাম গুলি হল— ‘নকশাল আন্দোলন ও পূরাণের ইতিহাসের ছায়ানৃত্য’, ‘যথেচ্ছাচারের উত্তরাধিকার: ঈশ্বর বনাম রাষ্ট্র’, ‘বিকল্প দর্শনের প্রয়োজন বোধ এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ’, ‘বৈকল্পিক রাজনীতি ও কমিউনিস্টদের প্রতিষ্ঠা’, ‘মনস্তত্ত্বের আয়রনি ও বৈষম্যের বীজ’, ‘চোর অনির দেহ’, ‘কেউ কেউ আছে যারা আমাদের সকলকে দেখছে’ ইত্যাদি।

শ্রাবণী পাল ‘সাতের দশক, বাংলার গ্রাম ও বাংলা ছোটোগল্প’[১৪] শিরোনামে নিবন্ধটিতে তিনি প্রথমে বাংলার কৃষক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি তেভাগা কৃষক আন্দোলন ও নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা করে ষাটের দশক থেকে গ্রাম বাংলার কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও আন্দোলনের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণে জমিদার-জোতদারদের শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামী চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

ষাট-সত্তর দশকের বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র অভিমুখ নিয়ে উক্ত গবেষকেরা যে আলোচনা করেছেন, তা যে কোনও গবেষকের কাছে সহায়ক ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাঁদের আলোচনায় সময় ও বিষয় ভাবনার বহুমাত্রিকতা যেভাবে উঠে এসেছে সেখান থেকে যে কোনও নতুন বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বা নতুন কোন বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন ও সূত্রায়ণ সম্পর্কের রূপরেখা নির্মাণ করা একটা অনুপ্রেরণা বলে মনে করি।

৪

পূর্বোক্ত প্রাবন্ধিক বা সন্দর্ভকারেরা যে আলোচনা করেছেন তাতে ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার চিত্রনের পাশাপাশি শিল্পী ও শিল্পকর্ম এবং দেশ-জাতি-সত্তার অভিজ্ঞান উঠে এসেছে। ষাট-সত্তর দশকের বাংলা সাহিত্যের বহুমাত্রিক আলোচনার মাঝে আমাদের গবেষণায় আমরা ‘ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্প: প্রসঙ্গ অস্তিত্বের লড়াই’ শিরোনামে একটি বিশেষ দিককে দেখাবার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করবো। উক্ত সময়পর্বে রচিত সাহিত্যের আলোচনায় অন্যান্য গবেষক, প্রাবন্ধিকেরা যেখানে প্রেম, মনস্তত্ত্ব, যৌনতা, আন্দোলন (রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক) ও সামাজিক সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন

সেখানে আমাদের আলোচনার বিষয় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শতকের সবচাইতে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দুটি দশকে 'অস্তিত্ব' অর্থে মানুষের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য লড়াই।

৫

১৯৬০-১৯৭৯ এই ২০ বছরের প্রেক্ষাপট অনেকটাই বড় যদি সাহিত্যের সমস্ত প্রকরণে গবেষণার প্রস্তাবিত 'অস্তিত্বের লড়াই' শিরোনামে অনুসন্ধানকে প্রসারিত করে দেওয়া হয়। আমরা প্রকল্পিত বিষয়ের আলোচনার জন্য উক্ত দুই দশকের 'ছোটোগল্প' নামক সাহিত্য প্রকরণটি গ্রহণ করেছি। আবার এই দুই দশকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের সব ছোটোগল্পকার ও তাঁদের গল্প আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়নি। আমরা গবেষণায় তাঁদের গল্পই আলোচনার জন্য নিয়েছি যাঁদের ব্যক্তিসত্তা যুগসত্তার মধ্যে বিগলিত হয়ে যুগ-চেতনাকে বিশেষভাবে মুক্তি দান করেছে। বাংলা গল্পের আলোচনায় ষাটের দশকের শুরু থেকেই বিমল করের (১৯২১-২০০৩) হাত ধরে একঝাঁক লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষিত হয়েছে নতুন রীতি চর্চার অভিনবত্ব। এবং যাঁদের লেখা তথাকথিত প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর 'দেশ' ও 'পরিচয়' পত্রিকায় সরে গিয়েছিল। যেখানে লেখার বিষয় ছিল মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ, মনস্তত্ত্ব, লিবিডো সমস্যা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, হতাশা, শূন্যতা, বেকারত্ব, জীবন যন্ত্রণা ইত্যাদি। রাজনীতি, বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ তাঁদের লেখায় খুব কমই উঠে এসেছে। তবে একেবারেই যে আসেনি এমনটা নয়। ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল সময়ের ছাপ কমবেশি সব লেখকের ওপর এসে পড়েছিল। যে কারণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) মতো মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকারী লেখকের হাতে 'পলাতক ও অনুসরণকারী'র মতো রাজনৈতিক গল্প পাওয়া যায়। আমাদের এই গবেষণায় 'বাজারী পত্র-পত্রিকা'র সঙ্গে জড়িত লেখকদের গল্পের মধ্য থেকে মানুষের যন্ত্রণা, সংকট ও সমস্যাকে লড়াই বা মুক্তির ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। সেই সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনে যাঁদের গল্প প্রকাশিত হতো বা যে সমস্ত লেখক বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের গল্প আলোচনা করে গবেষণার প্রকল্পিত বিষয়কে উপস্থাপন করা হবে। প্রকল্পিত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সব গল্পকারদের গল্প আলোচনার মূল তিনটি অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হবে নিম্নে তাঁদের একটি তালিকা প্রদান করা হলো—

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), অমর মিত্র (১৯৫১-), অসিত চক্রবর্তী (১৯৫৪-), অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬), তপোবিজয়

ঘোষ (১৯৩৭-১৯৯০), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪), বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৯৫২-), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), মিহির আচার্য (১৯২৭-), মিহির ভট্টাচার্য (১৯৪৪-), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৪৪-), সুবিমল মিশ্র (১৯৪৩-), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫২-), স্বর্ণ মিত্র (১৯৪২-), হীরালাল চক্রবর্তী (১৯৪২-) প্রমুখ।

উপরিল্লিখিত গল্পকার ছাড়াও ষাট-সত্তর দশকের যুগভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে গল্প লিখেছেন আরও অনেক গল্পকার, যেমন— অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৮-২০১৭), উদয়ন ঘোষ (১৯৩৫-২০০৭), লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭), মণি মুখোপাধ্যায় (১৯৩৯-), নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অজিত মুখোপাধ্যায় (১৯২৯-), সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪-), ব্রজেন মজুমদার (১৯৩০-), জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (১৯৩৬-২০০৮), শৈবাল মিত্র (১৯৪৩-২০১১) প্রমুখ। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষণা কর্মের এই প্রকল্পে তাঁদের গল্প আলোচনা করতে না পারায় একটা দুঃখ থেকে গেল। পরবর্তী প্রকল্পে তাঁদের গল্পের আলোচনা করবার একটা প্রয়াস থাকবে।

৬

গবেষণার একটা প্রধান বিষয় গবেষণা পদ্ধতি। গবেষণাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান ও সহায়ক উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা অবিসন্দর্ভকে পূর্ণতা দান করতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণাপত্র, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কুচবিহার), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলকাতা), ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন আর্কাইভস্ ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহীত আর্কাইভস্ অধ্যায়নে গবেষণা কর্মকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক বা মূল উৎস হিসেবে বিভিন্ন আকরপঞ্জি যেমন— গল্পের মূল টেক্সট, পত্র-পত্রিকাদি, দিনলিপি, পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ করে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। সহায়ক বা গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন সমালোচনমূলক গ্রন্থ এবং এর পাশাপাশি আর্কাইভ্যাল ও বৈদ্যুতিন তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৭

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম— 'ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্প: প্রসঙ্গ অস্তিত্বের লড়াই'। শিরোনামটিকে নিম্নোক্ত ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায়: ষাট-সত্তর দশকের সময়ের অভিজ্ঞান

দ্বিতীয় অধ্যায়: ষাট-সত্তর দশকের গল্পকার ও গল্প

তৃতীয় অধ্যায়: ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

চতুর্থ অধ্যায়: ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্প: নিম্নবিত্তের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

পঞ্চম অধ্যায়: ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্প: মধ্যবিত্তের দ্রোহ চেতনা

ষষ্ঠ অধ্যায়: ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্প: অস্তিত্বের সংকট ও নারীর অবস্থান

প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি খাদ্য, উদ্বাস্তু, শ্রম, কৃষি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারি, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাজনিত কারণে মানুষের বিভিন্ন আন্দোলনগুলি নিয়ে। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান সমস্যা ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। এই দশকের শেষে ও ষাটের দশকে যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। আবার এই সময় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যের ঘাটতি। মানুষ অস্তিত্বের সংকটের কথা চিন্তা করে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনে নামে। ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালে দেখা যায় দুটি খাদ্য আন্দোলন। প্রথম খাদ্য আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগঠন 'price increase and famine resistance committee'-র একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। বিক্ষুব্ধ মানুষকে নিয়ে এই কমিটি সামতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ, কালোবাজারি, মজুতদারি, অনাহার, রেশনিং ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার অচলাবস্থা, সম্পদের অসম বণ্টনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতাকেও প্রশাসনের বিরুদ্ধে কলকাতার রাজপথ মুখরিত করে তুলতে দেখা যায়। ১৯৫৯-এর এই প্রথম খাদ্য আন্দোলনের কারণ, মানুষের দাবি, কৃষকসভার প্রস্তাব, পুলিশের দমন-পীড়ন ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে এবং এরপর ১৯৬৬-র দ্বিতীয় খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়ছে। দ্বিতীয় খাদ্য আন্দোলনের আলোচনার প্রেক্ষিত হিসেবে যে বিষয়গুলোর

উঠে এসেছে— ১৯৬২-র ভারত-চিন যুদ্ধ, ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনের ব্যর্থতা। উক্ত বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর খাদ্য আন্দোলনের বাস্তব ভূমিতে (প্রথমে বসিরহাট থেকে শুরু করে সরূপনগর, হাবড়া, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, চাকদা, উত্তরপাড়া প্রভৃতি) এই আন্দোলনের প্রকৃতি, হতাহতের সংখ্যা, আন্দোলনের সমর্থনকারী জনতা, পুলিশের আক্রমণ, কারারুদ্ধ করার বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এই অধ্যায়ে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে এবং বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অবদান আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষ যা প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ হয়নি। বরং মানুষের দাবি পূর্বের ন্যায় থেকে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারি, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারত্ব, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যা মানুষকে আন্দোলিত করে। ছাত্র-যুবদের হৃদয়কেও যা আন্দোলিত করে। তারা ষাট-সত্তর দশকের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যদিও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিন্যাসকেন্দ্রিক দেশের তথা রাজ্যের ছাত্র-যুব আন্দোলন বহুমুখী ও ঘটনাবহুল, তবুও বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের হয়ে তাদের আন্দোলনকে অস্বীকার করা যায় না। ষাট-সত্তর দশকের মধ্যবর্তীকালীন খাদ্য আন্দোলন, ডাক আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরুদ্ধ আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের যোগদান ছিল সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই আন্দোলনগুলিতে তাদের ভূমিকা এবং রাজনৈতিক বিন্যাসজনিত কারণে ছাত্র-রাজনীতির আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর এই অধ্যায়ে ষাট-সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতায় কৃষকেরা প্রত্যাশা রেখেছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে কৃষিতে তারা অনেক সুবিধা ভোগ করবে এবং তারা মনে করেছিল দেশে সুদিন আসতে চলেছে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে আধপেটা খেয়ে তাদের জীবন কাটে। সারাবছর পরিশ্রম করে যেটুকু ফসল তোলে সেখান থেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিভূ জমিদার, জোতদার ও বড় কৃষকদের দিতে বেশিরভাগটাই চলে যায়। জমিদারতন্ত্র তাদের নিংড়ে নিঃশেষ করে দেয়। এইরকম এক অস্তিত্বের সংকটে দেখা যায় কৃষকদের আন্দোলন (সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের এই আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে হলেও স্বাধীনতার পূর্ব

থেকে এবং আরও আগে বিগত শতাব্দি থেকে চলছিল)। ষাট-সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের বিচার-বিশ্লেষণের পূর্বে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন (সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন বাদ দিয়ে অন্যান্য কৃষক আন্দোলনগুলি ছিল অরাজনৈতিক, সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, কখনো বা জাতিগত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের এইসব কৃষক আন্দোলনগুলির প্রকৃতি সংক্ষেপে বিচার-বিশ্লেষণ করবার পর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গবেষণা প্রকল্পের ষাট-সত্তর দশকের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সময়ের একটি প্রভাবশালী কৃষক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ি অঞ্চলে জমিদার, জোতদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলন। এই আন্দোলন সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে ও নিয়ন্ত্রণে ভারতের 'কৃষকসভা' ও রাজনৈতিকভাবে বামপন্থী নেতৃত্বের একটা বড় ভূমিকা ছিল। বেআইনি ও বেনামি জমি দখল, প্রশাসনের স্বার্থসংরক্ষক জোতদার-মহাজনদের গুদামজাত সম্পদ লুণ্ঠন, কৃষকদের মিটিং-মিছিল-সমাবেশের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালের ২৫ মে এক সমাবেশে পুলিশের হঠাৎ আক্রমণে শিশু-বৃদ্ধ-রমণীসহ মারা যায় প্রায় দশাধিক মানুষ। পুলিশের এই বর্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এবং রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। উক্ত বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এই অধ্যায়ে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পের ষাট-সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবার আগে এই বিভাগে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভব ও তার গতি-প্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর শ্রমিক আন্দোলনের ওপর ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক পার্টির অবদান আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ষাটের দশকের শুরুর দিকে চিনের সঙ্গে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনীতিতে টান ধরে। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পের বাজারে মন্দা, রাজ্যের রপ্তানিভিত্তিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারের সংকোচনে পুঁজিপতিদের কিছু অংশ শিল্পে বিনিয়োগ ছেড়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করে। নতুন শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হয়, লক্ষিত হয় লক আউট, ছাঁটাই, লে অফ, ক্লোজার। এই সময় আবার কিছু দালাল ও সুবিধাভোগী শ্রেণির আবির্ভাব এবং প্রশাসনের উদাসীনতা শ্রমিকদের অসন্তোষকে

চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। দেশ এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক ধর্মঘট লক্ষিত হয়। যেমন, ষাটের দশকের শেষের দিকে হিন্দ মোটরসের শ্রমিকদের ধর্মঘট, দুর্গাপুর হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িস ইউনিয়নের ধর্মঘট, ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। শ্রমিকদের এই সমস্ত ধর্মঘটে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সমর্থন এবং এর বিপরীতে ধর্মঘট দমনে পুঁজিপতি ও প্রশাসনের কর্মকাণ্ড আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষাট-সত্তর দশকের বিভিন্ন গল্পকারদের গল্প সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ষাটের দশক বা সত্তরের দশকের গল্পকার ও গল্প বলে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করতে যাওয়াটা একটা সীমাবদ্ধতা। কারণ, কোন সৃষ্টিশীল লেখক কোন একটি সুনির্দিষ্ট দশকে সীমাবদ্ধ থাকেন না, আবার সুনির্দিষ্টভাবে দশক ধরে ছোটোগল্পকার বলে কোন গল্পকারকে চিহ্নিত করা যায় না। একজন সৃষ্টিশীল লেখক কোন সুনির্দিষ্ট দশকের পূর্ববর্তী দশকেও সৃষ্টিশীল থাকতে পারেন আবার পরবর্তী দশকেও সৃষ্টিশীল থাকতে পারেন। তবে, গল্পের প্রকাশকাল অনুযায়ী আমাদের ধরে নিতে হয় কোন বিশেষ দশকে কোন বিশেষ ছোটোগল্পকার কোন কোন ছোটোগল্প রচনা করেছেন। এবং সেই অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারি কোন বিশেষ লেখক কোন বিশেষ দশকে কীভাবে ছোটোগল্পের মধ্যে আসর জমিয়েছেন। আমরা মোটামুটিভাবে ১৯৬০-১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যে সব ছোটোগল্প বা গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে গল্পকারদের গল্প আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে যে সব গল্পকারদের গল্প ও লেখার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছ— অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৭-১৯৯০), দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৯), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), সুবিমল মিশ্র (১৯৪৩-), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) প্রমুখ। এছাড়াও এই সময়পর্বে গল্প লিখেছেন এমন আরও কিছু গল্পকারদের গল্প বা গল্পগ্রন্থের বিষয় ও যুগ মানসিকতা আলোচনা করা হয়েছে; তাঁদের মধ্যে আছেন— অজিত মুখোপাধ্যায় (১৯২৯-), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯), আব্দুল জব্বার

(১৯৩৪-২০০৯), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (১৯৩৬-২০০৮), দীপেন্দু চক্রবর্তী, নির্মল চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-), প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪-), বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৩৫-২০১৫), ব্রজেন মজুমদার (১৯৩০-), বেনু দাশগুপ্ত (১৯২৮-২০১০), মণি মুখোপাধ্যায় (১৯৩৯-), মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০), লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), শৈবাল মিত্র (১৯৪৩-২০১১), সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪-), সমরেশ মজুমদার (১৯৪৪-২০২৩), সমীর রক্ষিত (১৯৪০-), সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪-), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১৯০৮-১৯৬৪), স্বর্ণ মিত্র (১৯৪২-) প্রমুখ। উক্ত গল্পকারদের লেখার বিষয় ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে আমরা পেয়েছি সেই শ্রেণির গল্পকারদের যারা বহু-পরীক্ষিত সত্য ও নবনিরীক্ষায় জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প রচনার মধ্য দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন; আবার আরেক শ্রেণির গল্পকার যাঁদের ব্যক্তিসত্তা যুগসত্তার মধ্যে বিগলিত হয়ে যুগচেতনাকে বিশেষভাবে মুক্তিদান করেছেন। যদিও আলোচনার মধ্যে ষাট-সত্তর দশকের সময়ের প্রভাব পড়েছে এমন ছোটোগল্পগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আবার একইসঙ্গে গল্পের নির্মাণ ও বিষয়গত ভাবনার বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনাও করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছি। সমাজের দর্পণ হিসেবে সাহিত্যে শিল্পীদের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন অবস্থা যেমন নানাভাবে চিত্রিত, তেমনই রাজনৈতিক পটভূমি সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। অর্থও মানুষকে প্রভাবিত করে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনজীবনে ষাট-সত্তর দশক এক সংকটের কাল। কেননা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের গুণগত মান হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারি প্রভৃতি নানা কারণে পশ্চিমবাংলার জনজীবন বিকল হয়ে পড়েছিল। রাজ্যের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি জনজীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ষাট সত্তর দশকের অন্তর্বর্তীকালীন বিভিন্ন সময়ে কখনো আর্থিক উন্নয়ন হারের বৃদ্ধি ঘটেছে, কখনো অবনতি ঘটেছে। অর্থনীতির এই উত্থান-পতনের পেছনে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কাজেই, ষাট-সত্তর দশকের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও রাজনীতির কথা এসে যায়। আর ষাট-সত্তর দশকে এই সব বিষয় বুঝে নেওয়ার জন্য স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উৎপাদন কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার পর আমরা ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার গতি-প্রকৃতি

আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কেমন ছিল তা জানার এই বিভাগে প্রথমেই তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গতি-প্রকৃতি আলোচনা করে দেখা হয়েছে। এই আলোচনা করা হয়েছে কৃষি এবং শিল্প দুটি আলাদা বিভাগে। ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবস্থা সম্পর্কে জানতে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে— ভূমি সংস্কার, জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, জমিতে মধ্যবর্তীদের অবস্থান, প্রজাস্বত্ব, খাজনা, সমবায় ব্যবস্থা, সবুজ বিপ্লব, অপারেশন বর্গা ইত্যাদি। কৃষি উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচি এই বিভাগে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই বিভাগে কৃষিব্যবস্থায় ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচির রূপায়ণে সীমাবদ্ধতার কথাও আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এই বিভাগে শিল্পের উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে নেহরুর নেতৃত্বাধীন সরকার শিল্পায়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতামতকেও প্রাধান্য দেন। দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারভিত্তিক সমাজকাঠামোর মধ্যেই প্রচেষ্টা চালায় নেহেরুর নেতৃত্বাধীন সরকার। ঐক্যমতের আশ্রয় নিয়েই তাঁর সরকার রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় সরকারি-বেসরকারি কাজের মধ্যে ভাগাভাগি, তদারকি, স্বৈরাচারিতা যাতে না বাড়ে তা দেখা, কেন্দ্রীভবন, আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখা, ক্ষুদ্র শিল্পের নিরাপত্তা, পরিকল্পিত ব্যয় ও অগ্রসরের পথে পা বাড়ায়। আর শিল্পের বিকাশ ও দ্রুত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট আইন মাফিক (শিল্প বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫১) কাজও শুরু হয়। পুরো পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশকের শুরুর দিকে এই একই প্রক্রিয়ায় শিল্পের কাজের অগ্রসরতা লক্ষিত হয়। শিল্পের অগ্রসরতা বা সাফল্যের বিষয়টি আলোচনা করবার পর শিল্পের সীমাবদ্ধতায় যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে— চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল ব্যয়ের ফলে শিল্পোন্নয়নে বাধা, ১৯৬৫-র দুর্ভিক্ষ, শিল্পে কম বিনিয়োগ, শ্রমিক ছাঁটাই, বেতন সংকোচন, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন (এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি প্রভৃতি) সংগঠন ও কংগ্রেসবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে শ্রমিক বিক্ষোভ, শ্রমিকদের ধর্মঘট বা বিক্ষোভ দমনে প্রশাসনের দমনমূলক নীতি ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়ে ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্পে নিম্নবিত্তের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে এই অধ্যায়ে মানুষের বিত্ত পর্যায়ে নিম্নবিত্তের ধারণা নেওয়া হয়েছে। এরপর ষাট-সত্তর দশকে তাদের সমস্যা ও সংকটকে চিহ্নিত করে অস্তিত্বের

জন্য তাদের সংগ্রামকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ষাট-সত্তর দশকের বাঙালি নিম্নবিত্ত জীবন প্রতিমুহূর্তে ঘোরতর সংকট আর প্রতিরোধের চতুসীমায় বাঁধা পড়েছিল। যাপিত জীবনে যারা বস্তিতে, ফুটপাতে, ঝুপড়িতে, গ্রামে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীতে অর্থহীন-পরার্থপর জীবন অতিবাহিত করত। যারা ছিল দলিত, মথিত, লাঞ্ছিত, শোষিত। বিপন্ন অস্তিত্বের শেষ সীমা থেকে একসময় এই নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের চেতনায় লক্ষিত হয়েছিল শাসক ও শোষকের অনাবিল সংস্রব ও যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে টিকে থাকা বা বেঁচে থাকার তন্ত্রপাঠ। প্রতিবাদের হোমাগ্নি প্রোজ্জ্বলনে এগিয়ে এসে যারা নির্মাণ করেছিল নিরন্তর লড়াইয়ের সমাজভাষ্য। নিছক বেঁচে থাকার জন্য অবহেলিত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত এইসব মানুষের লড়াই-ই এই অধ্যায়ের আলোচনার অনিষ্ট বিষয়। সমাজের সমস্ত শ্রেণির পরিচয় ছাড়িয়ে চোখ ও মনকে প্রবাহিত করে দিয়ে নিম্নবিত্ত সেইসব মানুষের কথা তুলে ধরেছেন এমন গল্পকারদের মধ্যে এই অধ্যায়ে বারো জন গল্পকারের গল্পের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন— মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৭-১৯৯০), বেনু দাশগুপ্ত (১৯২৮-২০১০), স্বর্ণ মিত্র (১৯৪২-), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯), সুবিমল মিশ্র (১৯৪৩-) প্রমুখ।

ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্পে নিম্নবিত্তের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে আলোচনার কেন্দ্রভূমিতে রেখে গল্পের বিশ্লেষণে বিষয়গত ভাবনার শ্রেণিকরণ করে উঠে আসে যাবতীয় অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিবাদী স্পন্দন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দশ বছর, বিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও গ্রাম ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অগণিত কৃষক ও ভাগচাষির জীবনকে কীভাবে অপরিসীম দুঃখ, দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার হলাহলে দগ্ধ করেছে এবং বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছে তারই বৃত্তান্ত উঠে এসেছে মহাশ্বেতা দেবীর ‘মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ’ ‘অপারেশন? বসাই টুডু’, ‘জল’, ‘এম. ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ’, অসীম রায়ের ‘লখিয়ার বাপ’, দেবেশ রায়ের ‘রাখি পূর্ণিমার রাত’, তপোবিজয় ঘোষের ‘উত্তরের জানালা’, ‘প্রথম শ্রেণীর গল্প’, নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘কাকতাড়ুয়া’, বেনু দাশগুপ্তের ‘সন্তানের নাম ধান’, স্বর্ণমিত্রের ‘বাঘশিকার’, ‘আটটা ন’টার সূর্য’ প্রভৃতি গল্পে। এবং এইসব গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষেরা তেজ, সাহস ও বীরত্বের অসাধারণ শক্তি নিয়ে আভাসিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ' গল্পে রাখাল থেকে ভিখারি পরিচয়বিত্তে পুলিশ প্রশাসন ও উচ্চবিত্তের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ প্রকাশিত হয়েছে। সুবিমল মিশ্রের 'ময়দানে টাকার গাছ' গল্পেও আছে ক্ষুধার জ্বালায় নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে খান-আড়াই বিপন্ন মানুষের (ভিখারি) বেঁচে থাকার মর্মান্তিক প্রয়াস। অসীম রায়ের 'একশো পঁয়ত্রিশ' গল্পে নগর কলকাতার ঝুপড়িতে থাকা অসহায় নিম্ন শ্রেণির মানুষের ছিঁচকে চুরি করে অস্তিত্বকে বাঁচানোর লড়াই প্রতিভাসিত। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হালাল ঝাণ্ডা' গল্পে ষাট-সত্তর দশকের ব্লাকি, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্ব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং গুন্ডাগিরির রাজত্বে তীব্র অর্থনৈতিক বিপত্তিতে নিম্ন শ্রেণির মানুষেরা গাড়ির মেকানিক্যাল কাজে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি বেঁচে থাকার শেষ উপায়ে কখনো মারামারি করে, চুরি করে, কখনো বা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে এবং সেই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন ও গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও এই গল্পে উঠে এসেছে। দেবেশ রায়ের 'অনৈতিহাসিক' গল্পে বেঁচে থাকার জন্য এবং যাপিত জীবনকে চলমান রাখতে তিস্তা নদীর বন্যার জলের সঙ্গে লড়াই করে ভেসে আসা কাঠের উপর অসহায় মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা লক্ষিত। দেবেশ রায়ের 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম' ও সমরেশ বসুর 'জীবিকা' গল্পে পাগল-পাগলিরূপে মানুষের বেঁচে থাকার আশ্চর্য কৌশল লক্ষিত হয়েছে। এবং এইসব গল্পে নির্মিত হয়েছে দলিত, মথিত, পিষ্ট মানুষের সামাজিক দর্পণ। সমরেশ বসুর 'লড়াই', 'জীবিকা', 'এস্‌মাগলার' গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষেরা সমাজ ও সংসারে প্রতিরোধ ভেঙে দৃপ্ত সাহস নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে তাদের নিরন্তর লড়াইয়ের সমাজভাষ্য নির্মাণ করেছে।

ষাট-সত্তর দশকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলা ছোটোগল্পে নিম্নবিত্তের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে বিচার-বিশ্লেষণের কেন্দ্রভূমিতে রেখে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত জীবনের মাত্রা আবিষ্কারে পাওয়া গিয়েছে নিম্নবিত্তের সংকট ও সমস্যা এবং সেখান থেকে উত্তরণের বহুমাত্রিক উপলব্ধি বা প্রতিভাস। যে উপলব্ধিতে সৃজনশীল স্রষ্টাদের শিল্পকর্মে স্থান করে নিয়েছে নিম্নমানের কৃষক, ভাগচাষি, চা শ্রমিক, কলকারখানার শ্রমিক, দরিদ্র কেরানি, অসহায় ক্ষুধার্ত শিল্পী, মেছো, কাঠুরে, রাখাল, ভিখারি, পাগল-পাগলি ইত্যাদি। তারা সকলে স্রষ্টার গভীর সততা ও আন্তরিকতায় অন্যায়, শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে কখনো প্রতিবাদী চেতনায়, কখনো বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে, কখনো বা তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ভাস্বর। মহাশ্বেতা দেবীর যে গল্পগুলি এই অধ্যায়ে আলোচনার জন্য নেওয়া হয়েছে— 'মৌল অধিকার ও ভিখারি

দুসাদ', 'অপারেশন, বসাই টুডু?', 'জল', 'জল', 'এম. ডাব্লু. বনাম লখিন্দ'। লেখিকার 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ' গল্পটি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মানুষ কীভাবে ধুঁকে ধুঁকে দিনাতিপাত করে এবং বেঁচে থাকার জন্য লড়াই চালায় তারই নির্মম, নির্মেদ ও নিরাসক্ত বিশ্লেষণ। নিম্নবিত্ত খেতমজুরের অধিকারের কথা ও লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পে। গল্পের মূল চরিত্র বসাই টুডুর সংগ্রাম ও পাঁচবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমসাময়িক রাজনীতি, প্রশাসন, সংবিধান, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, বঞ্চনা, কিষাণসভা, কমিউনিস্ট পার্টি, তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, অপারেশন বর্গা, বেঠবেগারি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলিতে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' সংকলনের 'জল' গল্পে উঠে এসেছে জীবনের অত্যাবশ্যক উপাদান জলের জন্য নিম্ন শ্রেণির ডোম, চামার, চাঁড়ালদের জীবনের শেষ পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক শাসনের প্রতিভূ সন্তোষ পূজারীদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার পটভূমিতে নিম্ন শ্রেণির মানুষের জীবন-সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে লেখিকার 'বেহুলা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জল' নামাঙ্কিত আরও একটি গল্পে। 'এম. ডাব্লু. বনাম লখিন্দ' গল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত 'মিনিমাম ওয়েজ' স্থানীয় জোতদারদের মারফৎ খেতমজুরদের হাতে না পাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। অসীম রায়ের যে গল্পগুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে— 'একশো পঁয়ত্রিশ', 'লখিয়ার বাপ'। 'একশো পঁয়ত্রিশ' গল্পটি সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক জীবনে ফ্ল্যাট কালচারের পাশাপাশি বস্তিবাসী নিম্ন শ্রেণির মানুষের কঠিন সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। 'লখিয়ার বাপ' গল্পে আছে সত্তর দশকে জল সমস্যাকে কেন্দ্র করে হরিজন মানুষের হাহাকার ও সংগ্রামের কথা। নিম্ন শ্রেণির মানুষের ক্ষুধা কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং অস্তিত্বের জন্য তাদের সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে দেবেশ রায়ের 'ধর্না', 'রাখিপূর্ণিমার রাত', 'অনৈতিহাসিক', 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম' গল্পগুলিতে। 'ধর্না' গল্পে ষাটের দশকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ভয়াবহ ক্ষুধা সেখানে 'রিলিফ কিচেনে'র ব্যবস্থায় স্পষ্ট হয়। এবং এই গল্পের অতীশ্বরদের মত লঙ্গরখানায় খেতে না পাওয়া মানুষের ক্ষুধার জ্বালা গল্পকার করুণ অসহায়তা নিয়ে অঙ্কন করেছেন। 'রাখিপূর্ণিমার রাত' গল্পটি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিরোধের পাশাপাশি রথু ও বুধারুদের মতো নিম্ন শ্রেণির ভাগচাষিদের কঠিন জীবন সংগ্রামের গল্প। 'অনৈতিহাসিক' গল্পটি তিস্তা নদীতে পাহাড়ে বন্যার

জলে ভেসে আসা কাঠের ওপর নির্ভর করে গল্পের চরিত্র ভাসিন্দির কঠিন জীবন সংগ্রাম ও তার পরিবারের ভয়াবহ ক্ষুধাকে নিয়ে লেখা। দেবেশ রায় নাগরিক মানুষের পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বাজারে ভিরমি খাওয়া মানুষ, না খেতে পেয়ে মরে যাওয়া বা ওষুধ না পেয়ে মরে যাওয়া মানুষ, পেটের জ্বালায় পাগল বা পাগলি পরিচয়প্রাপ্ত মানুষ, কখনো বা ক্ষুধার তাড়নায় পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে ফেলে চলে যাওয়ার মত করুণ দৃশ্য তুলে ধরেছেন 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম' গল্পে। নবারুণ ভট্টাচার্য সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, আমলাতন্ত্র, কালোবাজারি, পুলিশ প্রশাসন ও গুণ্ডাবাহিনীর কথা নিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। তাঁর 'হালাল ঝাণ্ডা' গল্পে মাস্তান-গুণ্ডাদের দাপট লক্ষিত হয়। 'কাকতাড়ুয়া' গল্পটি বিহারের বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হরিজন আন্দোলন কেন্দ্রীক একটি গল্প। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নরকের প্রহরী' গল্পটি একটি মেলাকে কেন্দ্র করে নরকের পালা অভিনয়কারী নিম্ন শ্রেণির মানুষের নরক দৃশ্য প্রদর্শন করতে গিয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ ও পেটের দায়বদ্ধতার প্লটে নির্মিত। এই অধ্যায়ে সমরেশ বসুর চারটি গল্পের— 'জীবিকা', 'জীবিকা', 'লড়াই', 'এসমালগার' আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে নিচুতলার মানুষের জীবিকার্জনের বিচিত্র কৌশল লক্ষিত। 'জীবিকা' গল্পে আছে অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্করে পড়ে জীবনের সমস্ত কিছু হারিয়ে পাগল হয়ে যাওয়াকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণের চিত্র। গল্পকারের 'জীবিকা' নামাঙ্কিত আরও একটি গল্পে আছে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারিতে এক অসহায় আর্ত ক্ষুধার্ত শিল্পী (দুলাল) সাপের খেলা দেখিয়ে তার কথার জাদুতে মানুষের মনোহরণ করে জীবিকার্জনের কথা। মাছ-মারাদের জীবন-মরণের নিষ্ঠুর কঠিন লড়াই প্রাধান্য পেয়েছে 'লড়াই' গল্পে। সমরেশ বসু 'এসমালগার' গল্পে বিত্তহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে চালের চোরাই-চালানদারদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথে-প্রান্তরে কঠিন লড়াইয়ের কাহিনি শুনিয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বুঢ়া পিরের দরগাতলায়' গল্পটি আর্থিকভাবে বিপন্ন, লাঞ্ছিত একটি অন্ত্যজ পরিবারের চরম ট্র্যাজেডি। ষাট-সত্তর দশকের সময় চেতনাকে গল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তপোবিজয় ঘোষ। তাঁর গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে কেরানি, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, মস্তান-গুণ্ডাদের কথা থাকলেও তাঁর অনেক গল্পে নিম্ন শ্রেণির মানুষ ও কৃষকের কথা উঠে এসেছে। এই অধ্যায়ে তপোবিজয় ঘোষের তিনটি গল্প আলোচনার জন্য নেওয়া হয়েছে— 'আমেরিকার চন্দ্রযান ও পতিতপাবন', 'উত্তরের জানালা', 'প্রথম শ্রেণীর গল্প'। তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমেরিকার 'চন্দ্রযান ও পতিতপাবন' গল্পে একদিকে

পুঁজিবাদী আমেরিকা ও অপরদিকে পতিতপাবন নামে পশ্চিমবঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামের স্কুল-বোর্ডের বেয়ারার অসহায় জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এবিষয়ে গল্পকারের সমর্থন পতিতপাবনের প্রতি। 'উত্তরের জানালা' গল্পটি অস্তিত্বের লড়াইয়ে প্রশাসন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষিদের সরব হবার গল্প। 'প্রথম শ্রেণীর গল্প'-তে দীর্ঘদিন চলে আসা জমিদার ও জোতদারদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই উঠে এসেছে। ষাট-সত্তর দশকের নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রভাব এসে পড়েছিল দেশের নানা প্রান্তের কৃষকদের ওপর। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক কথাশিল্পীই গল্প-উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি বেণী দাশগুপ্তের 'সন্তানের নাম ধান' গল্পটি। জোতদার মদন দত্তের শোষণের বিরুদ্ধে দারিদ্র্য ও অনাহারে ক্লিষ্ট ভাতুড়ে গ্রামের কৃষকদের ধান রক্ষার লড়াই গল্পের অন্বিষ্ট বিষয়। স্বর্ণ মিত্রের 'বাঘ শিকার' গল্পটি ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তে জোতদার হত্যার বাস্তব কাহিনি। গল্পকারের 'আটটা ন'টার সূর্য' গল্পে ষাটের দশকের শেষের দিকে কৃষক নেতা চারু মজুমদারের নির্দেশিত পথে নকশালপন্থী যুবকদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জমিদার জোতদারকে হত্যার মাধ্যমে শ্রেণি-সংগ্রামকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তাঁর 'রজনীগন্ধার দুটি সন্ধ্যা' গল্পেও আছে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ ও বঞ্চিত নিম্ন শ্রেণির আদিবাসী মানুষের লড়ে উঠবার কাহিনি। ষাট-সত্তর দশকে ক্ষুৎকাতর সর্বহারা মানুষের অস্তিত্বের লড়াইকে নিয়ে গল্প লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে' গল্পে এক হা-অন্ন পরিবারের তিন সদস্য— আকাল, তার বৌ নয়না, আর আকালের বুড়ি মাকে অস্তিত্বের লড়াইয়ে জমির সোনালী ধান চুরির কাজে বের করেছেন গল্পকার। ষাট-সত্তর দশকের সৃজনশীল লেখক সুবিমল মিশ্রের যে সব গল্পের আলোচনা এই অধ্যায় করা হয়েছে— 'হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি', 'ছুরি', 'নাঙা হাড় জেগে উঠেছে', 'ময়দানে টাকার গাছ', 'দু-তিনটে উদোম বাচ্চা ছোটোছুটি করচে লেবেলক্রসিং বরাবর'। তিনি 'হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' গল্পে ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক অভিঘাতে যৌনতার অচ্ছুৎপনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, সেই সঙ্গে গল্পপ্রেক্ষিতে বামুনপাড়ার জমিদারের জমিতে বর্গাচাষি হারাণের জমির জন্য লড়াইও গল্পের উপজীব্য বিষয়। 'ছুরি' গল্পে সত্তর দশকের মানুষের সংকট ও সমস্যাকে বুঝে নিতে কোন সমস্যা হয় না। গল্পে কোন রক্তাক্ত মৃতদেহকে যেমন গাছের ডালে উল্টো

হয়ে ঝুলতে হয়, তেমনি মানুষ আর কুকুরের একই ডাস্টবিনে এঁটোকাঁটা কাড়াকাড়ি করে খাওয়ার দৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। 'নাঙা হাড় জেগে উঠেছে' গল্পটি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা কেন্দ্রিক একটি গল্প। গল্পকারের 'ময়দানে টাকার গাছ' গল্পটি খান-আড়াই বিপন্ন মানুষের গল্প। যারা খিদের জ্বালায় কুকুরের জীবন পর্যায়ে নেমে মৃত গাধার মাংস খায়, গলায় ও গায়ে নানা কসরৎ করে ভিক্ষাবৃত্তি করে। 'দু-তিনটে উদোম বাচ্চা ছোটোছুটি করচে লেবেলক্রসিং বরাবর' গল্পে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাঝে মানুষের মান-সম্ভ্রমের চাইতে খিদের জ্বালাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের দ্রোহ চেতনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে এই অধ্যায়ে মানুষের বিত্ত পর্যায়ে 'মধ্যবিত্তে'-র ধারণা নেওয়া হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে আমরা সেই শ্রেণিকেই বুঝি বিত্ত পর্যায়ে যারা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে। আবার মধ্যবিত্ত বলতে এক ধরনের মানসিকতাকেও বোঝায়, যা প্রতিনিয়ত আমাদের এক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শোণিত শিরায় ক্রিয়া করে। উচ্চবিত্তের মতো এদের নেই অনায়াসে সবকিছু পাওয়ার নেশা, ক্ষমতা বা নিম্নবিত্তের মতো নেই প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্ট, আঘাত, যন্ত্রণার জারণ। তাই, মধ্যবিত্ত-মানসে লক্ষিত হয় প্রেম-ভালোবাসা ও দ্বন্দ্ব, স্বপ্ন স্বপ্নভঙ্গ, প্রত্যাশা ও প্রত্যাশা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ, স্বার্থ ও স্বার্থত্যাগ, ক্ষোভ ইত্যাদির মানবিক ও মানসিক টানাপোড়েন। পশ্চিমবঙ্গে বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশকে নানা ঘটনার প্রভাবে (যেমন— চিনের সঙ্গে যুদ্ধ, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, খাদ্য আন্দোলন, ডাক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট, যুক্তফ্রন্ট সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসন, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি) উত্তাল সময় চলছিল। এই সময় মানুষের স্বাধীন জীবনের সপ্নময় গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এর রেশ এসে লেগেছিল মধ্যবিত্ত মননে ও চিন্তনে। মধ্যবিত্তের ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় তারা সবসময়ই তাদের অর্জিত শিক্ষা এবং মার্জিত সংস্কৃতিকে প্রত্যাশা পূরণের চাহিদা ও মহিমার সঙ্গে যুক্ত রাখতে চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু ষাট-সত্তর দশকের বিভীষিকাময় ও বিশৃঙ্খলাময় সময়ে তাদের যাপিত জীবন ছিল সংকট ও সমস্যায় পূর্ণ। ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে লক্ষিত হয়েছে কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাজনিত কারণে মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবন এক চরম বিভীষিকার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। আর উক্ত বিষয়াবলী সেদিন নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা

বঞ্চিত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে লক্ষিত হয়েছিল মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ। এই সময়েই আবার নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন এবং তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ বৈপ্লবিক উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক পতাকা হাতে নিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক তরুণ-যুব এই সময় সামন্ত-শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। ধর্মঘট, ঘেরাও, জমিদখল এবং পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তারা মৃত্যুও বরণ করেছিল। ষাট-সত্তর দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকট ও সমস্যা এবং তার উত্তরণে মধ্যবিত্তের দ্রোহ-চেতনা নিয়ে গল্প লিখেছেন ষাট-সত্তর দশকের অনেক গল্পকার। গবেষণার এই অধ্যায়ে আট জন গল্পকারের— অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬), তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৭-১৯৯০), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৯৫২-), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১-), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৪৪-) গল্পের বিশ্লেষণে ষাট-সত্তর দশকের মধ্যবিত্তের দ্রোহ-চেতনাকে বুঝে নেওয়া হয়েছে।

ষাট-সত্তর দশকের বাংলা গল্পে মানুষের বিত্ত পর্যায়ে মধ্যবিত্তের চরিত্রের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি ও বিষয়গত ভাবনার শ্রেণিকরণ করে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উঠে আসে মধ্যবিত্ত সম্পর্কিত আলোচনার দ্বি-মাত্রিক প্রতিভাস। যেখানে একদিকে আছে স্বার্থমগ্ন মধ্যবিত্ত, অন্যদিকে আছে স্বার্থত্যাগী মধ্যবিত্ত। আবার এর মধ্যেও লক্ষিত হয়েছে তরুণ-যুব বিপ্লবী, নারী বিপ্লবী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, কেরানি, অফিস কর্মী, শিক্ষক— এই ধরনের নানা বিভাজন। গল্পকার অসীম রায়ের 'আরম্ভের রাত', 'ভারতবর্ষ', 'গড়ালবাড়ি', 'অবনীভূষণ-চাটুজ্জে-সুষমা', 'অনি' গল্পে এবং মহাশ্বেতা দেবীর 'পরম আত্মীয়', 'এইচ. এফ. ৩৭: রিপোর্টাজ' গল্পে লক্ষিত হয়েছে শহর কলকাতার মধ্যবিত্তের বৃহৎ অংশের স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক বিশ্বাসের স্বরূপটি এবং এর বিপরীতে মধ্যবিত্ত পরিবারেরই আদর্শবাদী মাঝবয়স্ক ও তরুণ-যুবদের স্বার্থহীন আত্মত্যাগ। ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অন্যায়, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে তপোবিজয় ঘোষের 'কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ', 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা', 'ক্ষুৎকাতর', 'মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার', 'প্রথম শ্রেণীর গল্প', 'কপাটে করাঘাত', 'ইতিহাসের মানুষ' গল্পে লক্ষিত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্তের গণজাগরণের উচ্ছ্বাস। এরা কেউ কেরানি ('ক্ষুৎকাতর' গল্পের শচীকান্ত), অফিস-কর্মী ('প্রথম শ্রেণীর গল্পে'-র বর্ণিত ট্রেনযাত্রী),

কেউ শিক্ষক ('কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ' গল্পের স্কুল মাস্টার), কেউ অধ্যাপক ('মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার' গল্পের অধ্যাপক সনাতন বাবু), কেউ মূল্যবোধ-সম্পন্ন বৃদ্ধ ('কপাটে করাঘাত' গল্পের বৃদ্ধ ভূধরবাবু)— যাবতীয় অন্যায়, শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও প্রতিবাদী সত্তা তাদের সকলের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে। সপ্নময় চক্রবর্তীর 'আরওয়ালের হাত' গল্পে বিহারের আরওয়ালের খেতমজুরদের ওপর অমানবিক নৃশংসতা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের প্রতিবাদী সত্তা শিক্ষিত বাঙালি তরুণ-যুব মধ্যবিত্ত মননে কীভাবে স্পর্শ করেছিল তার চিত্র পাওয়া গেছে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের 'বড় গাছ' গল্পে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা শিক্ষিত ভদ্র ঘরের যুবতী নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তা নিয়ে উপস্থিত। অগ্নিগর্ভ সময়ের সূত্র ধরে এবং জীবন-যাপনের ভিত্তি থেকে ষাট-সত্তর দশকের মধ্যবিত্তের চেতনায় যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছিল গুপ্ত হত্যা, গণহত্যার রক্তাক্ত রাজনীতির এক প্রবল উৎক্ষেপে তা ছিন্নভিন্ন করতে চাওয়া হলেও মধ্যবিত্তের বিদ্রোহের স্থিতাবস্থাকে সমর্থন করেছিল সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'রক্তিম বসন্ত' গল্পে স্টেশনের ভেণ্ডার, চায়ের দোকানের ছোকরা, ঝাড়ুদার এবং পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে একটি শূণ্য ভাঁড় ছুঁড়ে মারা 'সংবেদনশীল হাত'। এভাবে গবেষণার এই অধ্যায়ে আমরা মধ্যবিত্তের নিরালম্ব জীবনের পলকা অস্তিত্ব, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থমগ্নতার বিপরীতে সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের দ্রোহ চেতনা, স্বার্থত্যাগকে শিল্পস্রষ্টার সৃজনশীল বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বতন্ত্র উষ্ণতায় প্রতিকায়িত হতে দেখি।

ষাট-সত্তর দশকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলা ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের দ্রোহ চেতনাকে বিচার-বিশ্লেষণের কেন্দ্রভূমিতে রেখে সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা আবিষ্কারে তৎপর সৃজনশীল স্রষ্টাদের সৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে বিশেষ বক্তব্য সচেতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকল্পিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই অধ্যায়ে অসীম রায়ের পাঁচটি গল্প বিশ্লেষণের জন্য নেওয়া হয়েছে— 'আরম্ভের রাত', 'অনি', 'ভারতবর্ষ', 'গড়ালবাড়ি', 'অবনীভূষণ-চাটুজ্জে-সুষমা'। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভোটে জয়লাভ দিয়ে 'আরম্ভের রাত' গল্পের সূচনা, এরপর গল্পে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের কার্যকলাপ ও চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে সময় চেতনাকে স্পষ্ট করেছেন গল্পকার। গল্পে বিজুর মতো আদর্শবান রাজনৈতিক কর্মী যারা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে কাঁধ দিয়ে এসেছে, তার কথায় সমাজের দুই শ্রেণির মানুষের চিত্র উদ্ভাসিত। একদিকে আছে সুখী মানুষের চিত্র, অপরদিকে আছে লাখ লাখ

মানুষের অনাহার, বিনা চিকিৎসা, অপমৃত্যু। এদের বাঁচানোর জন্য বিজুদের মতো মধ্যবিত্তরা সংগ্রামে নেমেছে। অসীম রায়ের 'অনি' গল্পে এক মধ্যবিত্ত যুবকের নকশাল-আন্দোলনের প্রবাহে অবগাহন ও বিপ্লব আনবার প্রচেষ্টায় তার চরম পরিণতি উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকের শেষের দিকে বিশেষ করে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও ভাবপ্লাবনে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবারের শ'য়ে শ'য়ে শিক্ষিত যৌবন অপচিত (অপচয়) হয়েছিল। গল্পটির সম্পূর্ণ অংশ অনির পিতার বিশ্লেষণী মন নিয়ে এবং তারই চেতনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বিবৃত। সেই বিবৃতিতে জানা যায়, শহর কলকাতার মধ্যবিত্তের বৃহৎ অংশের স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক বিশ্বাসের স্বরূপটি। অন্যদিকে, এই মধ্যবিত্ত পরিবারেরই তরুণ-যুবদের স্বার্থহীন আত্মত্যাগ। অনি যার প্রতিনিধি। 'অনি' গল্পের মতো 'ভারতবর্ষ' গল্পেও অসীম রায় পিতা ও পুত্রের স্ব-স্ব ভাবনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বরূপ, রাজনীতি ও তার ফাঁক-ফোকরকে তুলে ধরে ভারতবর্ষের আদর্শ চিন্তা, আদর্শ রাজনীতি, আর বিচ্যুতিকে উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। অসীম রায়ের 'গড়ালবাড়ি' গল্পের পটভূমি উত্তরবঙ্গ। জলপাইগুড়ি শহর থেকে বাইশ মাইল দূরে মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম গড়ালবাড়ি। এই ভূমিকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত স্কুল-মাস্টারের সন্তান অমিতাভর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে তাঁর পাঁচ বছর আগের জীবন ও বর্তমান জীবনের সম্পর্ক সূত্রকে এক সুতোয় গেঁথে ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক জীবনের বিশ্বাস ও ভাঙনের কথা শুনিয়েছেন গল্পকার। 'অবনীভূষণ-চাটুজ্জে-সুষমা' গল্পে অবনীভূষণ একজন সত্যনিষ্ঠ বামপন্থী কর্মী, অন্যদিকে চাটুজ্জে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন, আর উভয়ের মাঝখানে রয়েছেন চাটুজ্জের স্ত্রী সুষমা। গল্পটি ষাটের দশকের সেই সময়ের গল্প যখন কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, ক্যারিয়ারেস্ট করাপ্ট মানুষজন, মধ্যবিত্ত মানসে পার্টি সম্পর্কে সংশয় উদ্ভব হয়েছে তখন কিছু আদর্শবাদী ও আস্থাশীল বামপন্থী কর্মী অবনীভূষণের মতো পার্টির ভাঙনকে পাত্তা না দিয়ে কাজ করে গেছেন। গবেষণা প্রকল্পের এই অধ্যায়ের ভাব-সাযুজ্যে গল্পকার তপোবিজয় ঘোষের সাতটি গল্প বিচার-বিশ্লেষণের জন্য নেওয়া হয়েছে— 'কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ', 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা', 'ক্ষুৎকাতর', 'মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার', 'প্রথম শ্রেণীর গল্প', 'কপাটে করাঘাত', 'ইতিহাসের মানুষ'। 'কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ' গল্পে উচ্চবিত্ত বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিলাসী জীবন (নিত্যানন্দ কুণ্ডুদের জীবন) এবং সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের (মফঃস্বল স্কুলে মাস্টারি করতে যাওয়া গল্পকথক) উঞ্ছবৃত্তির স্বরূপটি চিত্রিত। ষাট-সত্তর দশকের নৈরাজ্যের চরমতম রূপের প্রকাশ তপোবিজয় ঘোষের 'একটি

মস্তানী গল্পের ভূমিকা'। গল্পের অধ্যাপক পাড়ার মস্তানদের নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে দেখেন— পটাশের মতো মস্তানরা খারাপ নয়, তারা পরিস্থিতির শিকার, তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা চালিত। গল্পের অধ্যাপক চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন গল্পকার। 'ক্ষুৎকাতর' গল্পে শচীকান্তের মধ্য দিয়ে গল্পকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন ষাট-সত্তর দশকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারির কারণে সংসার পালনে সাধারণ কেরানির অসহায় অবস্থা। মূল্যবৃদ্ধির কথা উঠে এসেছে গল্পকারের 'মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার' গল্পেও। গল্পের অধ্যাপক সনাতনবাবু মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণ কালোবাজারি, মজুতদারি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা জানলেও প্রশাসনের ভয়ে তাঁর ছাত্রদের শেখান মূল্যবৃদ্ধির কারণ উৎপাদনে ঘাটতি আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি। 'প্রথম শ্রেণীর গল্প'-তে অগণিত চাষি রাতের অন্ধকার মিছিলে রেললাইন পেরিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে, যার প্রজ্জ্বলিত প্রেরণায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক রেল-যাত্রীর জমাট জড়ত্বে তৈরি হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল গণজাগরণের উচ্ছ্বাস। খুন-জখমের রাজনীতিতে সত্তরের দশকের শুরুতে কপাটে করাঘাত মানুষের কাছে একটা অশুভ সংকেত নিয়ে আসতো, তারই বাস্তব প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে 'কপাট করাঘাত' গল্পে। 'ইতিহাসের মানুষ' গল্পে ইতিহাসের হাত ধরে উঠে এসেছে অত্যাচারী জোতদার পরিবারের কথা। ষাটের দশকের অব্যবহিত পূর্বে যুবকদের বেকারত্বকে নিয়ে লেখা দেবেশ রায়ের 'কোলকাতা ও গোপাল' গল্পটি সময়ের যথার্থ দলিল। মহাশ্বেতা দেবীর 'পরম আত্মীয়' গল্পটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের এক বেকার যুবকের জীবন-যন্ত্রণা ও সাংসারিক দায়ভারের বাচন। লেখিকার 'এইচ. এফ. ৩৭: রিপোর্টাজ' গল্পটি একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে সত্তরের দশকের এক অতিসাধারণ পরিবারের করুণ কাহিনি নিয়ে অঙ্কিত। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'অ্যাভলনের সরাই' গল্পে উদ্বাস্তু সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের 'বড় গাছ' গল্পে জোতদার পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা নারী ধর্ষণের পাশবিক দিক লক্ষিত। বিহারের আরওয়ালের খেতমজুরদের প্রতিবাদী সত্তা মধ্যবিত্ত মননে কীভাবে স্পর্শ করেছিল 'আরওয়ালের হাত' গল্পে তারই কথা শুনিয়েছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'রক্তিম বসন্ত' গল্পটি সত্তরের দশকের রক্তাক্ত রাজনীতির কথা এবং গোপন হত্যার কথায় নির্মিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্পে অস্তিত্বের সংকট ও নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে সভ্যতার বিকাশে নারী ও পুরুষ উভয়ের

সমান ও সক্রিয় অবদান অনস্বীকার্য হলেও ধীরে ধীরে পিতৃতন্ত্র নারীকে তার অবস্থানগত জায়গায় সীমাবদ্ধ করেছিল। তার জন্য গণ্ডি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এরপর সভ্যতার অগ্রগতির বিভিন্ন যুগে নারীর ওপর চলেছিল শোষণ, লাঞ্ছনা, অবমাননা। স্বাধীনতা পরবর্তী ষাট-সত্তর দশকের বাংলা গল্প আলোচনা করতে গিয়ে নারীর ওপর পুরুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। নারীর ওপর চলেছে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ। প্রতিক্রিয়াশীল গল্পকারেরা ষাট-সত্তর দশকের সময়ের যে দর্পণ এঁকেছেন তাতে নির্মিত হয়েছে সুবিধাবাদী সমাজব্যবস্থা ও নারীত্বের অবমাননার এক সকরূণ চিত্রকল্প। বিবৃত হয়েছে নারীর জীবন যন্ত্রণা ও বিচিত্র জীবনেতিহাস। যেখানে তাকে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হয়। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে নারীর অবস্থান, সংকট ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিরূপতায় নারীর সংকট ও সমস্যাকে চিহ্নিত করে তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল রাজনীতি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষজনিত কারণে আর্থিক মন্দা, কালোবাজারি, চোরাকারবারিতে যখন দেশ ছেয়ে যায় তখন এক প্রতিকূল পরিবেশে নারীরা আপন অস্তিত্বের জন্য, কেউ বা পরিবারের কথা চিন্তা করে পুরনো সামাজিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে নানা বৃত্তি অবলম্বন করে কর্মজগতের সক্রিয় হয়েছে। ষাট-সত্তর দশকে নারীদের মধ্যে কেউ আবার রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে। উক্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে গবেষণা প্রকল্পের এই অধ্যায়ে এগারো জন ছোটোগল্পকারের গল্প আলোচনা করা হয়েছে— সুবিমল মিশ্র (১৯৪৩-), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৭-১৯৯০), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯), মিহির আচার্য (১৯২৭-), মিহির ভট্টাচার্য (১৯৪৪-), অসিত চক্রবর্তী (১৯৫৪-), হীরালাল চক্রবর্তী (১৯৪২-), অমর মিত্র (১৯৫১-) প্রমুখ।

ষাট-সত্তর দশকের বাংলা গল্পের বিষয়গত ভাবনার শ্রেণিকরণ করে উঠে আসে নারী সম্পর্কিত আলোচনার বহুমাত্রিক প্রতিভাস। মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালভুজঙ্গ’, ‘আউরি বাউরি’, তপোবিজয় ঘোষের ‘টুকুন বউ’, ‘খোঁয়াড়’, হীরালাল চক্রবর্তীর ‘চিহ্ন’, অমর মিত্রের ডাইন’ ইত্যাদি গল্পে চলমান ইতিহাসের গভীরে আছে প্রচ্ছন্ন আগুনের দিকে তর্জনি সংকেত, গল্পগুলিতে নারীরা প্রতিবাদী চেতনায় ভাস্বর।

মহাশ্বেতা দেবীর 'মাদার ইণ্ডিয়া', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাতাসী', অসিত চক্রবর্তীর 'ঈশ্বরের মা উল্লাসিনী' ইত্যাদি গল্পে নারীদের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে, অস্তিত্বের সংকট থেকে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার পর বেঁচে থাকা ও ঘুরে দাঁড়ানোর আশ্চর্য কৌশল। ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে অর্থনৈতিক মন্দা, চোরাকারবারি, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি বিষয় জনজীবনকে পিষ্ঠ করছিল, নারীরা এর প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' গল্পে ঘরে ও বাইরে নারীর সামাজিক অবস্থানের অবমূল্যায়নকে চিহ্নিত করে গল্পকার সুবিমল মিশ্র দেখিয়েছেন শুধুমাত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারীর আব্রু ও ইজ্জতকে মুখোশধারী ভদ্র ও বিত্তশালী মানুষের কাছে বিলিয়ে দিতে হয়। তাঁর 'ময়দানে টাকার গাছ' গল্পটিতে এক বিপন্ন নারী, যার খিদে ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি নেই, উলঙ্গ অবস্থায় পুরুষের সামনে লজ্জা পাওয়ার ব্যাপারটিকে সে হারিয়ে ফেলেছে। এই ধরনের গল্পগুলিতে শিল্প স্রষ্টারা তীব্র, তীক্ষ্ণ, শাণিত বাণীর কাটাকাটা শব্দে সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকে স্পষ্ট করেছেন। সমরেশ বসুর 'বিবেক', 'উৎপাত' গল্পে নারীদের নিতান্ত দায়ে পড়ে জীবন-জীবিকা হিসেবে বেশ্যাবৃত্তিকে গ্রহণ করতে হয়, অথচ নারীদেরকে বেশ্যারূপে দেখা পিতৃতন্ত্রেরই একটি অবমাননাকর দিক; শিল্প-স্রষ্টা নারী শোষণের গতানুগতিক ভাবনার রূপান্তর এনে নিজস্ব উপস্থাপনার বিশ্বস্ত রীতিতে লিঙ্গ বৈষম্যের বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে সমকালীনতার খোলা জলের প্রবাহমানতায় নারীকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। মিহির আচার্যের 'মা', মিহির ভট্টাচার্যের 'বাল্মীকির মা', হীরালাল চক্রবর্তীর 'চিহ্ন' গল্পে নারীর আদর্শ স্নেহপরায়ণ মাতৃরূপ চিত্রিত, ষাট-সত্তর দশকের ভয়ংকর বিভীষিকাময় সময়ে সন্তান বিচ্ছেদের ভাবনায় হতাশার হাহাকারে যারা ক্ষতবিক্ষত।

আর ষাট-সত্তর দশকে বাংলা গল্পে নারীদের নিয়ে আলোচনার সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা আবিষ্কারে তৎপর সৃজনশীল গল্পকারদের গল্পে স্বতন্ত্র উষ্ণতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে নারী সম্পর্কিত আলোচনার বিশেষ বক্তব্য সচেতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। সুবিমল মিশ্রের 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' গল্পের একদিকে আছে ঘরে ও বাইরে নারীর সামাজিক অবস্থান, অন্যদিকে আছে বামুনপাড়ার জমিদারের জমিতে বর্গাদার হারাণের জমির জন্য লড়াই। হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের এই গল্পে স্বামী মারা যাবার পর শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে ভদ্র ও বিত্তশালী মানুষের কাছে হারাণ মাঝির

বিধবা বৌকে নিজের আব্রু ও ইজ্জত বিলিয়ে দিতে হয়। সুবিমল মিশ্রের 'ময়দানে টাকার গাছ' গল্পটি 'খান-আড়াই' বিপন্ন মানুষের গল্প— একটি মরদ, একটি নারী ও তাদের বাচ্চা। যাদের খিদে ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি নেই। গল্পে বর্ণিত নারীটিও উলঙ্গ অবস্থায় পুরুষের সামনে লজ্জা পাওয়ার ব্যাপারটিকে অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলেছে। মহাশ্বেতা দেবীর যে গল্পগুলি এই অধ্যায় আলোচিত হয়েছে— 'দ্রৌপদী', 'মাদার ইণ্ডিয়া', 'প্রতারক', 'বান', 'বাঁয়েন'। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে এক আদিবাসী নারীর সংগ্রামের কাহিনি 'দ্রৌপদী'। অস্তিত্বের লড়াই ও নারী সত্তার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই গল্পের দ্রৌপদী হত্যাকাণ্ড, থানা আক্রমণ এবং চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই গল্পে নির্যাতন ও শোষণের বিপক্ষে দ্রৌপদীদের টাঙি-হেঁসো-তির-ধনুক নিয়ে নিধনকার্য চালাতে দেখা যায়। মহাশ্বেতা দেবীর 'মাদার ইণ্ডিয়া' গল্পে ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে বন্দুক আর হেঁসোর লড়াইয়ে শশীধাড়ার বউ তার স্বামী ও বড় ছেলেকে হারায়। এরপর কলকাতা শহরে এসে বাঁচার অবলম্বন খুঁজলেও তার মেজো ও ছোট ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি। যদিও গল্পের শেষে নিজের মৃত্যুর পর ফুটপাতবাসী ভিখারির দলের 'অশৌচ' পালনের মধ্য দিয়ে সে ব্যক্তি মা থেকে সমষ্টির মা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'প্রতারক' গল্পের মুখ্য বিষয় প্রতারণা করা। স্বামী মারা যাবার পর এক বিধবা মহিলাকে প্রতারিত হতে হয় তার নিজের মেয়ে-জামাইদের দ্বারা। ক্ষুধার সাথে যুঝে টিকে থাকার কাহিনি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর বান গল্পটি অনন্য। গল্পটিতে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক ব্যঙ্গ। 'বাঁয়েন' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অন্তে-বাসী ডোম সমাজের এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব অঙ্কন করেছেন। ষাট-সত্তর দশকের বীভৎস সময়ের কথাকার তাপোবিজয় ঘোষ। এই সময় পর্বে তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে বীভৎস সময়ের ছবি আঁকলেও তাঁর কোনও গল্প ভাঙনের মধ্যে শেষ হয়নি। 'টুকুন বউ' গল্পে টুকুন গ্রামের জোতদারের (করুণাময়) শালার (ব্রজেশ্বর) দ্বারা ধর্ষিত হবার পর সে বামফ্রন্টের 'কৃষক সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হয় এবং জোতদারের বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষকদের সম্মিলিত আন্দোলনে সে অংশগ্রহণ করে। নারী ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তপোবিজয় ঘোষের এজাতীয় আরেকটি গল্প এই বিভাগে আলোচনার জন্য নেওয়া হয়েছে। গল্পটির নাম 'খোঁয়াড়'। টুকুনের মতো এই গল্পের কুসুমও গ্রামের উচ্চবিত্ত যুবকের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। এরপর সুবিচার পাওয়ার বিপরীতে উল্টো তার ওপরেই পুলিশ কেস হয় এবং জেলখানায় তার ওপর চলে একপ্রস্থ অত্যাচার। যদিও গল্পের শেষে বামফ্রন্টের পার্টি অফিসে সে রান্নার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯)

তাঁর ‘জটায়ু’ গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তী ষাটের দশকের সেই ভয়াবহ চিত্রপট অঙ্কন করেছেন যখন হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। গল্পের নারী চরিত্র দুর্গা যার বলি। গবেষণা প্রকল্পের বিষয় ভাবনাকে মাথায় রেখে এই অধ্যায়ে সমরেশ বসুর যে গল্পগুলি আলোচনার জন্য নেওয়া হয়েছে— ‘বিবেক’, ‘কুন্তি সংবাদ’, ‘উৎপাত’। ‘বিবেক’ গল্পটি ষাট-সত্তর দশকের পার্টিগত দ্বন্দ্ব, মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, খুনোখুনি, রাজনৈতিক পালাবদলকে নিয়ে লেখা। যার প্রভাব পড়ে সাধারণ নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের ওপর। গল্পে ফেরিওয়ালা গোপালদার স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তিকে জীবন-জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য দায়ী গল্পে বিভূতিদের বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলন। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এসেও মানুষ যে অন্ধকারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি তারই প্রেক্ষিতে লেখা সমরেশ বসুর ‘কুন্তি সংবাদ’ গল্পটি। গল্পে মুনিয়া নামক এক কিশোরীর ওপর লক্ষিত হয় নারী নির্যাতনের নিষ্ঠুর করুণ দৃশ্য। সমরেশ বসুর ‘উৎপাত’ গল্পটি কলকাতার কয়েকটা স্টেশনের ফারাকে চারটি প্লাটফর্মের এক স্টেশনে একই পরিবারের দুই ভাইয়ের ভিখারির পেশা অবলম্বন করে লেখা। আর তাদের স্ত্রীরা ভিক্ষার পাশাপাশি রাত হলেই শরীর বেচে বেঁচে থাকার লড়াই চালায়। গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি গল্প এই অধ্যায়ে আলোচনার জন্য নেওয়া হয়েছে— ‘কালভুজঙ্গ’, ‘আউরি বাউরি’, ‘বেঁচে থাকা’, ‘বাতাসী’। ‘কালভুজঙ্গ’ গল্পে প্রচণ্ড খরায় এক হা-অন্ন পরিবারের চারজন সদস্য— নিশি, তার স্ত্রী সোনামণি ও তাদের দুই মেয়ে অঙ্গি-বঙ্গি ক্ষুধার তাড়নায় মাঠের ধান চুরির মতো কাজকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেয়। সেই সঙ্গে অসহায় সোনামণিকে পুরুষের প্রলোভনের শিকার হতে হয়। ‘আউরি বাউরি’ গল্পে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসা জননী চরিত্র পরিবারের রেশন কার্ড বানানোর বিনিময়ে কু-প্রস্তাব পায়। গল্পের শেষে জননী নারীর ইজ্জত ও সম্ভ্রমকে বাঁচাতে মায়ার দ্বারা মোক্ষম চাল দিয়ে গুপি চরিত্রকে আকর্ষণ করে গলা কামড়ে হত্যা করে। ‘বেঁচে থাকা’ গল্পের নারীরা— শ্যামা, ফুল্লরা, ধিরুর মা, কোকিলারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে হাড়ি-পাতিল বেচে বেঁচে থাকার প্রবল বাসনা নিয়ে নিজের নিজের মতো করে প্রত্যেকে বেঁচে থাকে। ‘বাতাসী’ গল্পের নারী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শিকার। মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সে তার স্বামীকে হারিয়ে এপার বাংলায় চলে এসে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। মিহির আচার্যের ‘মা’ গল্পটি একটি রাজনৈতিক গল্প। এই গল্পের মা সরোজিনী রাজনৈতিক আন্দোলন করে সমাজ পরিবর্তনে তার সন্তানকে মদত দেয়। এই অধ্যায়ে আলোচনার জন্য নেওয়া মিহির ভট্টাচার্যের ‘বাল্মীকির মা’ গল্পটি একটি

রিফিউজি পরিবারের গল্প। এই গল্পের মা সত্তরের দশকের রাজনৈতিক বিভীষিকাময় সময়ে সন্তানের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাতে বিচ্ছেদের ভাবনায় হতাশার হাহাকারে ক্ষতবিক্ষত। অসিত চক্রবর্তীর 'ঈশ্বরের মা উল্লাসিনী' গল্পটি এক বিধবা জননীর সংকট ও সমস্যার গল্প। হীরালাল চক্রবর্তীর 'চিহ্ন' গল্পটি ডুয়ার্স অঞ্চলের চা শ্রমিকদের লড়াইয়ের কাহিনি। অমর মিত্রের 'ডাইন' গল্পে আছে সত্তরের দশকে বিহার-বাংলা সীমান্ত অঞ্চলের বাবু সম্প্রদায়ের বেআইনি জমি অধিগ্রহণের কথা এবং ভাগচাষিদের এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। এই গল্পের নারী স্বামীর মৃত্যুর পর 'ডাইন' অপবাদ নিয়ে ভাগচাষিদের লড়াইকে নেতৃত্ব দেয়।

৮

ষাট-সত্তর দশকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের সৃজনশীল গল্প-স্রষ্টাদের নির্বাচিত বাংলা গল্পের সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পর পাওয়া গেছে দেশ-কাল-জীবনপ্রবাহের বহুমাত্রিক স্পন্দন। যেখানে আছে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নারীর ভাবনা ও বাচন। এবং যে স্পন্দনে উঠে এসেছে ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজের মর্মগত ইতিহাস। সময়ের প্রতিঘাত ও জীবন-যাপনের দ্বন্দ্বে পাওয়া গেছে মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাহতি, প্রত্যাশা ও প্রত্যাশা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব-নিকেশ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ, স্বার্থমগ্নতা ও স্বার্থত্যাগ, মানবতা ও মূল্যবোধহীনতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও হতাশা, উল্লাস ও বিষাদ, নির্মাণ ও বিশৃঙ্খলা, উত্থান ও পতন, উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা এবং শোষণ, দমন, পীড়ন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। গবেষণাকর্মে সময়ের প্রভাব-প্রতিফলন-প্রতিক্রিয়া অঙ্কনে স্বাধীনতা পরবর্তী ষাট-সত্তর দশকের বাঙালি জনমানসের জীবন-প্রবণতার যে বহুমাত্রিক প্রতিভাস নির্মাণের প্রয়াস করা গেল, তা অতীতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানুষের ভাবনাকে যেমন নানাভাবে অন্বিত করেছে তেমনি এই দুই দশক ভবিষ্যতের দশককেও একই স্বরে স্পন্দমান করে তুলেছে। স্রষ্টার ভাবনাকে কোনও একটি দশকে রেখে বিচার করাতে হয় সীমাবদ্ধতা, সেই স্রষ্টা পরবর্তী দশকেও নির্মাণ করেন তাঁর ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিসৌধ। মহাসময়ের প্রবহমানতায় নানা রূপান্তর ও পরিগ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে কথাবৃত্তান্ত। আমরা গবেষণাকর্মের ষাট-সত্তর দশকে 'অস্তিত্বের লড়াই'-কে আলোচনার কেন্দ্রভূমিতে রেখে বাঙালি জীবনের স্পন্দনকে বুঝে নেবার প্রয়াস করেছি।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. চাকমা. নীরুকুমার, অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ঢাকা, 'বাংলা একাডেমী ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ৩৩-৪৫

২. https://www.academia.edu/43662320/%E0%A6%85%E0%A6%B8_%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4_%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6_%E0%A6%93_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6 (অনুসন্ধান তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

৩. https://www.academia.edu/43662320/%E0%A6%85%E0%A6%B8_%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4_%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6_%E0%A6%93_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6 (অনুসন্ধান তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

৪. চাকমা. নীরুকুমার, অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ঢাকা, 'বাংলা একাডেমী ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ২

৫. https://www.academia.edu/43662320/%E0%A6%85%E0%A6%B8_%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4_%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6_%E0%A6%93_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6 (অনুসন্ধান তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

৬. দাস. অরূপকুমার, ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৭-৩৮৯

৭. আচার্য. অনিল (সম্পা.), সত্তর দশক (দ্বিতীয় খণ্ড)—দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ২৭১-২৯২

৮. ‘পরিচয়’, সমালোচনা সংখ্যা, মে-জুন ১৯৮০, পৃ. ১৪-৩৪

৯. ঘোষ. নির্মল, নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৫-২৫২

১০. মন্ডল. সেলিম বক্স, সত্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস, কলকাতা, একুশ শতক, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১-১৮৮

১১. ‘দেশ’, ৪.৪.১৯৮৭, পৃ. ৫৭-৬২

১২. ‘নন্দন’, পৌষ ১৩৯৫, পৃ. ৮৭৪-৮৮৭

১৩. বসু. প্রদীপ, মননে সৃজনে নকশালবাড়ী, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, অগাষ্ট ২০১২, পৃ. ৫১-৬৭

১৪. ঐ, পৃ. ১২২-১৩৬